কিশোর রহস্য উপন্যাস

নীল থাবা

জুবায়ের হুসাইন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

এক.

'মরতে এসেছ? জলদি ভাগো!!'

পাক্কা পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বিপু ভাইয়া।

পিঠে ঝোলানো একটা পিঠ-ব্যাগ। তাতে দুই সেট জামা-প্যান্ট ও টুকিটাকি আরও কয়েকটা জিনিস। যেখানেই বেড়াতে যায়, সঙ্গে থাকে ব্যাগটা।

আজই বেড়াতে এসেছে সে, তার ফেসবুক ফ্রেন্ড সাকিবদের বাসায়। এখনও বাসায় পৌঁছতে পারেনি। বাস থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে আসার পর হঠাৎই কিছু একটা তার সামনে এসে পড়ে। থমকে দাঁড়ায় সে। তাকিয়ে দেখে, দলা একটা পাকানো চিরকুটটা। নিচু হয়ে হাতে উঠিয়ে নেয়। তারপর এপাশ-ওপাশ তাকায়, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। এবার সে ভাঁজ খোলে কাগজের টুকরোটার। চোখের সামনে মেলে ধরতেই কাঁপা কাঁপা হাতের লেখাটা ভেসে ওঠে।

থতমত খেয়ে যায় কিশোর গোয়েন্দা বিপ্লব খান ওরফে বিপু ভাইয়া। কে দিলো চিরকুটা? তাকেই কি দিলো? কেন দিলো? মরতে আসার কথাই-বা বলছে কেন? এর আগে তো কখনো এখানে আসেনি সে। এলাকার কেউ তাকে চেনেও না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যে ফ্রেন্ডের বাড়িতে সে বেড়াতে এসেছে, তার সাথে আগে কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। এমনকি, তার চেহারাও সে চেনে না। ফেসবুকে সাকিবের কোনো প্রোফাইল পিকচার দেওয়া নেই। শুধু তা-ই না, পারসোনাল কোনো পিকচারও সে তার টাইমলাইনে শেয়ার করেনি। চ্যাট করার সময় অনেক বলেও প্রোফাইলে ছবি যোগ করাতে পারেনি বিপু।

আর এখানে হঠাৎ চলে আসারও কারণ আছে। আজ প্রায় চার-পাঁচ দিন ধরে ফেসবুকে সাকিবকে পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাসেজ পাঠালেও কোনো রিপ্লাই আসছে না। ভাগ্যিস, আগেই কৌশলে সাকিবের ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিল। নইলে এই চলে আসাটাও হতো না। সেদিন বাড়িতে যাওয়ার ডিটেইল লিখে জানিয়েছিল সাকিব। তাইতো আজ অচেনা-অজানা এই জায়গাটায় হুট করে চলে আসার সাহস দেখাতে পেরেছে সে। তা ছাড়া নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা বিপুর একপ্রকার শখও বলা যেতে পারে।

চিরকুটটা এখনও হাতে ধরা। চেহারা থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাবটা এখনও কাটেনি। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে চারপাশটা দেখে নিল আবার। নাহ, কোথাও কেউ নেই। পায়ে চলা মেঠো পথটা বেশ নির্জন। এই শেষ বিকেলের সময়টা তাই কেমন একটা থমথমে ভাব নিয়ে বিরাজ করছে। একটা ভারী ও চাপা আবহ চারধারে। বুকের ভেতরটা একটু

কেঁপে উঠল নিজের অজান্তে। হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে ঢুকপুক করতে লাগল। পেটটা কেমন খালি খালি লাগছে। হঠাৎ করেই গলাটা শুকিয়ে গেল।

কেন হচ্ছে এমন? তাহলে কি কোনো অশুভ কিছুর সংকেত পেয়ে যাচ্ছে তার পঞ্চেন্দ্রিয়? আগেও এমনটি একাধিক ক্ষেত্রে হয়েছে!

মেঠো পথটা বিপ্লব খানের ঠিক ফিট পঁচিশেক পেছন থেকে ডানে মোড় নিয়েছে। আর সামনে বেশ খানিকটা সোজা নাক বরাবর চলে গেছে। তারপর ওখান থেকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে ডানে। দু-পাশে গাছপালা। অনেকটা ঝোপঝাড়ের মতো। বাম পাশটায় ঝোপঝাড় একটু ঘন। ওই ঘন ঝোপের মধ্যে ইতোমধ্যেই অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। দ্রুত সাকিবদের বাড়িতে পৌঁছতে হবে। নইলে পথে কোনো বিপদও ঘটে যেতে পারে।

বাস থেকে নেমে মেইন রাস্তা থেকে বায়ে ঢুকে এই পর্যন্ত চলে এসেছে বিপু। পথে একটা মুদি দোকানে জিজ্ঞেস করেছিল সাকিবদের বাড়িটা সম্পর্কে। দোকানদার কেমন ত্যারচাভাবে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। আশেপাশের আরও দু-একজন ওকে দেখে কেন জানি একটু চক্ষুজোড়া কুঞ্চিত করেছিল। বিষয়টিকে তখন গুরুত্ব দেয়নি। আসলে এই নতুন অঞ্চলে সে তো বন্ধুর বাড়িতে শুধু বেড়াতেই এসেছে। অন্য কোনো মিশন বা কোনো কেস নিয়ে আসেনি। তাই একটু সরলভাবেই নিয়েছিল সবকিছু। কিন্তু এখন ভাবছে, সেটা মোটেই ঠিক হয়নি। গোয়েন্দারা যেখানেই যায়, সবকিছুকে সিরিয়াসলিই নিতে হয়।

এই নিয়ে তৃতীয়বার চিরকুটের লেখাটা পড়ল বিপু ভাইয়া।

না, এবারও এই লেখার কারণ বুঝল না। আচ্ছা, এটা ওকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে তো? কে লিখেছে? আর তার কাছে ছুড়ে দিলোই-বা কে? সে কেন তার সামনে আসছে না? সামনে আসতে কোনো কারণে কি ভয় পাচ্ছে?

মনে মনে একটু হাসার চেষ্টা করল সে। তাতে যদি পরিবেশটা একটু হালকা হয়। মনের মধ্যে সাহসকে জাগিয়ে তোলা যায়। একবার ভাবল, এটা ওকে লেখা হয়নি। হয়তো আগে থেকেই এখানে পড়ে ছিল। কিন্তু এই ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কারণ, সে যখন একমনে গুনগুন করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ 'টুক্' করে কাগজের টুকরোটা তার সামনে পড়ে। টুকরোটা একটু গড়িয়ে যেতেও দেখেছে। কাজেই সে নিশ্চিত হলো, চিরকুটটা তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো—কে লিখল? কেন লিখল? আর লিখলই যদি, তাহলে সামনে আসছে না কেন? এই অচেনা-অজানা জায়গায় তার তো কোনো শত্রু থাকার কথা নয়।

আচ্ছা...ভাবল সে, এটা সাকিবের কাজ নয় তো? কোনোভাবে হয়তো তার আসার খবর জেনে গেছে। আর এখন দুষ্টুমি করে এই চিরকুট-রহস্য হাজির করেছে। হতে পারে না? তা পারে। কিন্তু সে তো এখনও সামনে আসছে না। কী মুশকিল!

ধুর! আর টেনশন নিতে পারছে না বিপুর নার্ভগুলো। ঠিক আছে, আগে বেচারার সাথে দেখা হোক, তারপর এর মজা উশুল করা যাবে।

শব্দ করে বড়ো একটা শ্বাস নিল বিপ্লব। তারপর সামনে হাঁটা ধরল। কিন্তু একটু দূর যেতেই আবার থমকে দাঁড়াল। তার মনে হলো, কেউ ওকে ফলো করছে। চট করে পেছন ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই। তাহলে কি মনের ভুল? উলটাপালটা সব ভাবছে বলে অবচেতন মন ওকে ভয় দেখাতে চাচ্ছে?

আবার হাঁটতে লাগল সে। দুই কদম কী তিন কদম এগিয়েছে। আবার থমকে দাঁড়াল। এবার দাঁড়ানোর পরও কারোর পায়ের শব্দ শুনল।

পেছন ফিরে তাকাল। না, এবারও কাউকে নজরে পড়ল না।

এই প্রথমবার গা'টা ছমছম করে উঠল বিপ্লবের। এদিকে সন্ধেও প্রায় হয়ে এসেছে। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল সেটটা বের করে বাটন টিপে সময় দেখল। হ্যাঁ, আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে সন্ধে হতে। আশ্চর্য, বাস থেকে নেমে ওই দোকানটা ছাড়িয়ে আসার পর বেশ কয়েকবার সাকিবকে ফোন দিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই সিম বন্ধ দেখিয়েছে। সাকিবের মোবাইলে একবারও ঢুকতে পারেনি। এখানে কি নেটওয়ার্কের কোনো প্রবলেম আছে? থাকতে পারে। সাকিবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আর নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকলে বাড়িতে যোগাযোগ করাও কষ্টকর হবে তাহলে।

বুকটা ঢিবঢিব করছে বিপ্লবের। পথ ভুল করে অন্য কোথাও চলে আসেনি তো? না, তা হওয়ার কথা নয়। কারণ, সাকিবের বর্ণনা অনুযায়ীই সে এতদূর এগিয়ে এসেছে।

পুরোটাই তার মেমোরিতে ইনস্টল হয়ে আছে। এত সহজে তার মেমোরি থেকে কোনো ডকুমেন্ট ডিলিট হয়ে যায় না। আর তা ছাড়া পথ ও আশপাশের বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওই তো পথটা একটু সামনেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিশাল শিমুল গাছটা।

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল সে। তারপর আবারও হাঁটতে শুরু করল। এবার এক পা সামনে বাড়াতেই পেছনে স্পষ্ট কারও পায়ের শব্দ শুনল। কিন্তু এবার আর থামল না। কৌশল পালটিয়েছে। দেখতে হবে, কে তাকে ফলো করে।

হেঁটে চলল বিপ্লব। পেছনে সমান তালে এগিয়ে আসছে এক জোড়া পদশব্দ। কানজোড়া খরগোশের মতো খাড়া করে রেখেছে বিপু।

চলতে লাগল ওভাবে। একসময় চলা অবস্থাতেই সাঁই করে পেছন ফিরে তাকাল এবং চোখাচোখি হয়ে গেল ছেলেটার সাথে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে দুজনই। ছেলেটার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় দেখতে পেল বিপ্লব। নিজের মধ্যে নিজেকে কেমন গুটিয়ে নিয়েছে সে।

'কে আপনি?' হঠাৎ প্রশ্নটা ছুড়ে দিলো বিপ্লব।

ছেলেটা কোনো জবাব দিলো না।

এগিয়ে গেল বিপ্লব। একটু পিছিয়ে গেল ছেলেটা।

'আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন?' আবার প্রশ্ন করল বিপ্লব। অচেনা কাউকে আপনি করেই সম্বোধন করে সে।

এবারও কোনো জবাব দিলো না ছেলেটা।

বয়সে বিপ্লবের চেয়ে একটু বড়োই হবে। তবে শরীরটা কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া। মাথার চুলগুলো বেশ লম্বা, এলোমেলো হয়ে আছে। পরনে কালো ফুলপ্যান্ট আর গায়ে ফুলহাতা স্টাইপ দেওয়া শার্ট। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

'আপনি...'

বিপ্লবের কথাটা শেষ হলো না, তার আগেই বলে উঠল ছেলেটা—'তুমি কেন ফিরে এসেছ? মরতে?'

দুই.

যারপরনাই অবাক হলো বিপ্লব। কিন্তু পরক্ষণই ভাবল, এটা নিশ্চয়ই সাকিব হবে। ওকে ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যই এই নাটক সাজিয়েছে। নাহ, ছেলেটা পারেও বটে! তাকে তো সত্যিই ভড়কে দিয়েছে।

বলল—'তুমি যতই চেষ্টা করো সাকিব, আমি কিন্তু ঠিকই তোমাকে ধরে ফেলেছি। তবে তোমার প্লানের তারিফ সত্যিই না করে পারছিনে।'

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল এই কথা শুনে। যেন খুবই অবাক হয়েছে। ঠোঁটজোড়া ঈষৎ ফাঁকা হয়ে আছে।

‘এই সাকিব, কিছু বলো।’ ছেলেটাকে চুপ থাকতে দেখে আবারও বলল বিপ্লব। ‘আমি সেই কতদূর থেকে তোমার কাছে চলে এলাম। কী, বলেছিলাম না ঠিক একদিন তোমাদের গ্রামে চলে আসব? এখন বিশ্বাস হলো তো?’

ছেলেটার চেহারা আরও কিছুটা বিস্ময়ে ঢেকে গেল। যেন দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি একটি কথাও বের হবে না মুখ দিয়ে।

এতক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তারা। এবার বিপ্লব তার কাঁধটা ধরে একটু ঝাঁকি দিলো। বলল—‘কী ব্যাপার? কোনো কথা বলবে না? এই সাকিব, কী হয়েছে তোমার? কোনো সমস্যা?’

‘তু..তু...তু...’ তোতলাতে লাগল ছেলেটা।

‘হ্যাঁ, আমি। কী, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না? আরে ফেসবুকে তুমি না হয় তোমার কোনো ছবি দাওনি, কিন্তু আমার ছবি তো দেখেছ। চিনতে পারছ না?’

‘মা..মা..মানে, তু..তু...’

‘ধ্যাত! এই, তুমি কি তোতলা?’ ফিক করে হেসে দিলো বিপ্লব। ‘যাক, একটা তোতলা বন্ধু জুটে গেল তাহলে আমার।’

‘তুমি কে?’ এইবার পুরোটা বাক্য শেষ করল ছেলেটা।

‘মানে?’ দপ করে মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল বিপুর।

‘তুমি আসলে কে?’

‘এই সাকিব, কী হচ্ছে এসব?’ হাসিটা নিমেষেই উধাও হয়ে গেছে মুখ থেকে বিপ্লবের। ‘আরে আমি, তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ড বিপ্লব খান, বিপু।’

‘তুমি আসলে,...আমি...’ যেন কথা হারিয়ে ফেলল ছেলেটা। বিভ্রান্ত দেখাল চেহারা। ভীষণ বিধ্বস্ত লাগছে।

‘বুঝেছি, বিশ্বাস হচ্ছে না এই তো? ঠিক আছে, আগে তোমাদের বাড়িতে চলো। একটু রেস্ট নিই, তারপর গল্প করা যাবে। দেখছ না, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে? ইস! গ্রামে দেখি সন্ধ্যার আগেই সন্ধ্যা নেমে পড়ে।’ বলে ছেলেটার একটা বাহু ধরে টানতে লাগল বিপ্লব। কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ল না ছেলেটা। অপলকে তার দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটার দৃষ্টি এখনও বিপ্লবের চেহারা থেকে সরেনি। কোনো বড়ো একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। বিপ্লব সেটা পড়তে পারছে না। আসলে সে তো এখন কিছুটা

নিরাপত্তা বোধ করছে। এই অচেনা-অজানা জায়গায় ঠিক পথ চিনে বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছানো কষ্টকর হতো।

'তুমি তাহলে সাকিব নও?' ছেলেটা হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করে বসল।

আর তাতে ভীষণভাবে চমকালো বিপ্লব।

'সাকিব? আমি?' এইটুকু বলে যেন ভীষণ হাঁপিয়ে উঠল বিপ্লব। এরপর কী বলবে তা খুঁজে পেল না।

'তুমি তাহলে কে?' একইভাবে আবার জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'আ...আমি তো বললাম আমি বিপ্লব খান, বিপু। তোমার ফেসবুক ফ্রেন্ড।' কিছুটা ঘাবড়ে গেছে বিপ্লব। গলাটা এবার সত্যিই খসখসে হয়ে উঠেছে। সিরিশ কাগজের মতো।

'দেখ ভাই, আমার কোনো ফেসবুক ফ্রেন্ড নেই। আর ফেসবুক জিনিসটা কী, তা জানিও না। এখন বুঝেছি, তুমি সাকিব নও। সাকিবের ডান কপালে একটা কাটা দাগ ছিল। তোমার নেই। তাহলে কে তুমি? কেন এসেছ এখানে?' ছেলেটার মধ্যে এখন বল ফিরে এসেছে।

'এই দাঁড়াও দাঁড়াও। তুমি আমাকে সাকিব বলছ কেন? তার মানে...' ঠোঁটে আঙুল রেখে কী যেন ভাবল কিশোর গোয়েন্দা। তারপর আবার বলল— 'সামথিং ইজ রং। হুঁ, আমি বোধ হয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি।'

'না, তুমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছ না। তুমি জানো না তুমি কোন বিপদের মধ্যে এসে পড়েছ। বাঁচতে চাইলে এক্ষুনি ভাগো। যে পথে এসেছ, সেই পথে চলে যাও।'

'মানে? আপনি আমাকে...'

'স্যরি, এভাবে বলতে চাইনি; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমাকে ওরা দেখলে...' ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক একবার দেখল ছেলেটা।

'কারা দেখবে আমাকে?' বুঝতে পারে না বিপ্লব। বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমে। 'আমার বিপদ হবে কেন? বুঝতে পারছি আপনি আমার বন্ধু না। কিন্তু আমি তো আমার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। জানিয়ে আসিনি। কারণ, আমি ওকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছি।'

ঝট করে বিপ্লবকে ধরে রাস্তার বাঁয়ে একটা মোটা গাছের আড়ালে নিয়ে গেল ছেলেটা। মুখে আঙুল রেখে চুপ থাকতে বলল।

একটা মোটরসাইকেল চলে গেল শহরের দিকে। পেছনে রেখে গেল ধোঁয়ার একটা ঘূর্ণি। ধোঁয়ার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, আরোহী কারা তা ভালো করে দেখা গেল না। তবে দুজন যে ছিল, এটা বুঝতে পেরেছে বিপ্লব।

আরও কয়েকটা মুহূর্ত আড়ালেই রাখল বিপ্লবকে ছেলেটা। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এলো। বলল—'আসলে হয়েছে কী, সাকিবকে দেখতে ঠিক তোমারই মতো। পার্থক্য শুধু ডান কপালে একটা কাটা দাগ ছিল ওর।'

'আস্তে আস্তে!' তাকে থামিয়ে দিলো বিপ্লব। 'ডান কপালে কাটা দাগ ছিল বলছেন কেন? সাকিব এখন কোথায়? কিছু হয়েছে ওর?'

'আসলে কী বলব তোমাকে।' আমতা-আমতা করতে লাগল ছেলেটা। 'আসলে, মানে...'

'বলুন আমাকে, প্লিজ!' অনুনয় ঝরে পড়ল বিপ্লবের কণ্ঠে।

'ঠিক আছে, তোমাকে সব খুলে বলব। তা ছাড়া তুমি সাকিবের বন্ধু বলছ যখন, তোমার বিষয়টা দেখাও এখন আমার দায়িত্ব। চলো, আমরা এগোই।'

'কোথায়?'

'আপাতত আমার বাড়িতে চলো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

'ঠিক আছে, চলুন।'

'ও আর একটি কথা, সাকিব আমাকে তুমি করেই বলত। কাজেই ওর বন্ধু হিসেবে তুমিও আমাকে তুমি করেই বলবে।'

'ধন্যবাদ। চলুন যাওয়া যাক।'

'উঁহু।'

'ও স্যরি। চলো যাই। কিন্তু তোমার নামটা...'

একটু হাসল ছেলেটা। তবে বেশি ফুটল না সে হাসি। বলল—'আফজাল আমার নাম।'

'চলো আফজাল। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। গলাটাও ভীষণ শুকিয়ে গেছে।'

গ্রাম্য পথটা ধরে হেঁটে চলল তারা।

সন্ধ্যার আঁধার তখন চেপে বসতে শুরু করেছে। গ্রামে যে একটু আগেভাগেই অন্ধকার নেমে আসে, তা ভালোভাবেই অবলোকন করল কিশোর গোয়েন্দা বিপ্লব খান ওরফে বিপু ভাইয়া। তবে বুঝতেও পারল না, কোন রহস্যের জালে আটকে পড়তে যাচ্ছে সে।

তিন.

বিপ্লবকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে ভরসা পেল না আফজাল। তাই নিয়ে তুলল সাকিবের আব্বার চাচাতো ভাই আজমল হাওলাদারের বাড়িতে। আপাতত এই বাড়িটাকেই বিপ্লবের জন্য নিরাপদ ভাবল সে।

আজমল হাওলাদার তো প্রথমটায় বিপ্লবকে দেখেই ভীষণভাবে চমকালেন, আফজালের মতোই। সাকিব ফিরে এসেছে? কোথায় ছিল সে এ কয়দিন?

কিন্তু ভুল ভাঙল আফজাল তাকে সব বুঝিয়ে বলাতে। বিপ্লবও আফজালকে সহযোগিতা করল।

বাড়ির আর কাউকে জানানো হলো না ব্যাপারটা। বিপ্লবের জায়গা হলো কাছারি ঘরটাতে। বাড়ির মূল বিল্ডিং থেকে একটু তফাতেই কাছারি ঘরটা। একসময় বহুল ব্যবহৃত হলেও এখন আর তেমন হয় না। দূরদূরান্ত থেকে আজমল হাওলাদারের কোনো আত্মীয় বেড়াতে এলে তার জন্যই খুলে দেওয়া হয়। তবে বিপ্লব ভেতরে প্রবেশ করে বুঝল, অন্তত মাসখানেকের মধ্যে কারোর পদধূলি পড়েনি এখানে।

পুরো বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ আছে। কিন্তু কাছারি ঘরের বিদ্যুতের লাইনটা দিন সাতেক আগে কেটে গেছে। সেটা আর ঠিক করা হয়নি। তাই হারিকেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টুকিটাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও করে নিতে হয়েছে ঘরটা। কাজটা আফজালই সারল।

তারপর সকালে আসবে বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল আফজাল। একটু পর চলে গেলেন আজমল হাওলাদার। একা হয়ে গেল বিপ্লব। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। প্লেটে করে খাবার নিয়ে হাজির হলেন আজমল। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টিউবওয়েল থেকে হাত-মুখ ধুইয়ে আনলেন বিপ্লবকে। তারপর বিপ্লবের খাওয়া শেষ হলে দরকারি দু-একটা কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বিপ্লব বেশ সাহসী ছেলে। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের ভয় এসে তার ওপর ভর করল। এ রকম একটা নতুন জায়গায় নির্জন একটা ঘরে একলা কীভাবে থাকবে সে? ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করছে। কাঠের দরোজাটার খিল আটকে দিয়ে বিছানায় এসে বসল। পুরোনো খাট। তার ভর পেয়ে মচমচ করছে। ভেঙে যাবে না তো?

হারিকেনের তেজও কমে আসছে। উঠে গিয়ে সলতে বাড়িয়ে দিলো। একটু বাড়ল আলো। কিন্তু পরক্ষণই আবার কমতে শুরু করল। হারিকেনটা ধরে ঝাঁকি দিলো। যা আশঙ্কা করেছিল তা-ই; তেল শেষ হয়ে গেছে। আর হয়তো মিনিটখানেক আলো দেবে ওটা। তারপর?...

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটা স্পর্শ করল। না, ওটা জ্বালা যাবে না। চার্জ শেষ করতে চায় না সে। কিন্তু রাত সবে শুরু হয়েছে। পুরো রাতটা এভাবে অন্ধকারে কাটাতে হবে তাকে?

ভয় যেন ঘরের প্রতিটি কোনা থেকে উঁকি দিতে লাগল। নিজের মধ্যে অনেকটাই গুটিয়ে গেল বিপ্লব। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি।

খাটে উঠে বসল আবার। মচমচ শব্দটা যেন আরও জোরে হলো এবার। মনের অজান্তেই একবার চমকে উঠল।

না, সাহসহারা হলে চলবে না। মনে সাহস রাখতে হবে। 'ভয় পেলে ভয়, ভয় না পেলে কীসের ভয়?' মনে মনে কয়েকবার আওড়াল সে। দাদুর কাছে শেখা একটা দুআ পড়ল মনে মনে। এই দুআ আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পড়তেন এবং আমাদের শিখিয়েছেন—'আল্লাহুম্মা ইন্না নাঝআলুকা ফি নুহুরিহিম, ওয়া নাউজুবিকা মিং শুরু রিহিম।' এর অর্থ : হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে শত্রুর মোকাবিলায় পেশ করছি, তুমি তাদের দমন করো। আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। দুআটি সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি ও মিশকাত শরিফে আছে। দুআ পড়ামাত্রই কিছুটা জোর পেল সে।

হারিকেনের আলো নিভুনিভু। আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর পুরোপুরি অন্ধকারে ঢেকে যাবে ঘরটা।

বাইরে ঝিঁঝিদের একটানা শব্দ হচ্ছে। ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথাও। তাতে সাড়া দিলো আরও কয়েকটা কুকুর।

পাশেই কোনো গাছে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল বিচ্ছিরি কর্কশ কণ্ঠে।

শুয়ে পড়ল বিপ্লব, জড়োসড়ো হয়ে।

চোখ বন্ধ করল। হুড়মুড় করে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল একরাশ ভয় তার মাথা-ঘাড়-সমস্ত শরীরের ওপর। মুহূর্তেই আবার খুলে ফেলল চোখজোড়া। অনেক কষ্টে রাতের ভয় দূর করার দুআটি মনে করল। এই দুআটি সুনানে আত-তিরমিজি শরিফে আছে। একটু শব্দ করেই পড়ল, আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাজাতিশ শায়াতিনি ওয়া আই ইয়াহদুরুন। অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের ওসিলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা এবং আমার কাছে তাদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

নিভে গেছে হারিকেনের আলো।

ঘরটা এখন পুরোপুরি অন্ধকার।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল। বাটন টিপে একটা নম্বর বের করে তাতে কল দিলো। কানে ধরে রইল। নাহ, রিসিভ করছে না কেউ।

কল শেষ হয়ে গেল। আবারও কল দিলো। এবারও ফল হলো একই। কেউ সাড়া দিলো না।

ক্ষান্ত দিলো বিপ্লব। না, এভাবে করতে থাকলে চার্জ নষ্ট হবে। কাল কোথাও চার্জ দেওয়ার সুযোগ পাবে কি না জানে না। জানে না কী পরিস্থিতিতে পড়বে সে। ওকে সবাই সাকিব বলে মনে করবে। কীভাবে সামলাবে সবাইকে? আজমল হাওলাদার কোনোভাবে সাহায্য করবেন কি?

হ্যাঁ, আপাতত এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা যায়। তাতে অন্তত ভয়গুলো বাসা বাঁধতে পারবে না।

গোড়া থেকে আবার বিষয়গুলো ভাবল সে। কয়েক দিন ধরে ফেসবুকে সাকিবের কোনো সাড়া পাচ্ছিল না বিপ্লব। তাই হুট করেই সিদ্ধান্ত নিল, সশরীরে এসে হাজির হবে সাকিবদের বাড়িতে। তা ছাড়া স্কুলেও ছুটি পাওয়া গেছে কয়েক দিনের। এই সুযোগটা সে হাতছাড়া করবে কেন?

যেই ভাবা সেই কাজ। বাসে চড়ে বসে। নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমেও পড়ে। এরপর কিছুটা ভ্যানগাড়িতে করে আসে। তারপর পায়ে হাঁটা পথ। পথের মোড়ে এক মুদি দোকানদারকে সাকিবদের বাড়ির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই কেমন যেন হয়ে যায় লোকটা। যেন ভিনগ্রহের কোনো ভাষায় কথা বলেছে। গুরুত্ব দেয়নি সে। চলে এসেছে ওখান থেকে। খেয়াল করেনি আরও কিছু লোক কেমন কেমন দৃষ্টিতে ওকে দেখছে।

এরপর তার সামনে এসে পড়ে চিরকুটটা—'*মরতে এসেছ? জলদি ভাগো!*'

সেখান থেকেই শুরু। পরিচয় হয় আফজালের সাথে। তারপরের কাহিনি তো খুবই সংক্ষিপ্ত।

একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে বিপ্লব। নিশ্চয়ই সাকিবদের কোনো বিপদ হয়েছে। বড়ো কোনো বিপদ। আফজালের কাছে যতটুকু শুনেছে, তাতে এটাই পরিষ্কার হয়েছে।

কী হয়েছে সাকিবের? কোথায় সে? আফজাল তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে এখানে এনে কেন রাখল? এর পেছনে কি অন্য কোনো রহস্য আছে? কী সেই রহস্য?

আফজালকে কতটা বিশ্বাস করা যায়? সে যা বলেছে, তা কি সব সত্যি? নাকি কোনো চাল চেলেছে? নাকি সাকিবই এসব কিছু করছে? তাহলে এই আজমল হাওলাদারের ভূমিকা কী তাতে? তিনি তো মুরুব্বি মানুষ। তিনি কেন বাচ্চাদের কোনো খেলার মধ্যে নিজেকে জড়াবেন?

নাহ, সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আসলে এখন তার ব্রেনটা একটু রেস্ট চাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবেশে রেস্ট নেবে কীভাবে?

'সাকিব, তুমি কেন এমন করছ আমার সাথে?' অস্ফুটে ফিসফিস করে বলে উঠল বিপ্লব। 'তুমি কি চাওনা তোমার সাথে আমার দেখা হোক? কেন লুকিয়ে রাখছ নিজেকে? প্লিজ! দেখা দাও আমার সামনে।'

এই সময়ই দরোজায় 'খটখট' করে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠল বিপ্লব।

স্থির হয়ে গেল সমস্ত শরীর। নিশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে। যেন নিশ্বাসের শব্দ শুনলেই কেউ এসে ওকে আক্রমণ করবে।

আবারও 'খটখট'।

একইভাবে বিছানায় পড়ে রইল বিপ্লব। কানজোড়া খাড়া হয়ে গেছে।

'অ্যাই বিপু, তুমি কি জেগে আছো?' বাইরে থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল কেউ।

চার.

বিপ্লব কোনো সাড়া দিলো না। বুঝতে চাইছে বাইরে যে আছে, সে শত্রু না মিত্র।

'অ্যাই, আমি আফজাল বলছি। তুমি কি জাগনা?' আবারও শোনা গেল কণ্ঠটা। এবার আগের চেয়ে স্পষ্ট।

না, ভাবল বিপ্লব। খামোখাই ভয় পাচ্ছিল সে। ওটা আফজালই হবে। আজ তো অনেকক্ষণই একসাথে ছিল তারা। কাজেই কণ্ঠটা অনেকটাই পরিচিত হয়ে গেছে।

খাট থেকে নামল বিপ্লব। এগিয়ে গেল দরোজার দিকে।

'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও। কাল সকালে আসব আমি।' বলল আফজাল। পদশব্দ শোনা গেল। হয়তো চলে যাচ্ছিল আফজাল।

তাকে থামাল বিপ্লব। বলল—'ও আফজাল? এই তো খুলছি দরোজা।' খিল টেনে দরোজা খুলল বিপ্লব। পকেট থেকে মোবাইল বের করে বাটন টিপে অন্ধকার কিছুটা সরানোর চেষ্টা করল।

ভেতরে প্রবেশ করল আফজাল।

'কী ব্যাপার, ঘুম আসছে না বুঝি?' জিজ্ঞেস করল আফজাল।

'নাহ, ঘুম আসছে না।' জবাব দিলো বিপ্লব। 'নতুন জায়গা তো...'

'আমিও সেই সময় তাড়াহুড়ো করে তোমাকে রেখে গেলাম। আসলে তখনই আমার ভাবা উচিত ছিল, নতুন জায়গায় একা একা তুমি ঘুমোতে পারবে না। বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে শুতে গেছি, এই সময় মনে পড়ল কথাটা। তাই চলে এলাম, তোমার সাথে ঘুমাতে। আপত্তি নেই তো?' বলে অন্ধকারেই বিপ্লবের মুখের দিকে তাকাল আফজাল।

বিপ্লব মুহূর্তেই জবাব দিলো—'না না, আপত্তি থাকবে কেন?' আসলে সে তো একজন সঙ্গীই চাচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু সেটা কীভাবে বলে সরাসরি। তাই একটু ঘুরিয়ে বলল—'তুমি আমার সাথে ঘুমালে আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি তোমার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি না থাকে।'

'যাক,' বলল আফজাল। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল।'

'কোন ব্যাপারে?' কথাটা ধরল বিপ্লব।

'না কিছু না,' এড়িয়ে গেল আফজাল। খাটে শুতে শুতে বলল—'রাত অনেক হয়েছে। এখন ঘুমিয়ে পড়া উচিত। সারাদিন নিশ্চয়ই অনেক ধকল গেছে তোমার শরীরের ওপর দিয়ে। এখন ফুল রেস্ট দরকার। আর তা ছাড়া সকালে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহই জানেন। কাজেই শরীরটা চাঙা করে নেওয়া দরকার।'

'হুঁ।' বিপ্লবও আর কথা বেশি বাড়াল না। আসলেই তার এখন ফুল রেস্ট দরকার। সকালে কী হবে তা সকালেই ভাবা যাবে। এখন সঙ্গী যেহেতু একজন পাওয়া গেছে, কাজেই নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। বলল—'ওসব সকালে ভাবলেও চলবে। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, এসো ঘুমিয়ে পড়ি।'

বলল ঠিকই, কিন্তু ভাবনাগুলো সহসাই তার মগজ থেকে গেল না। এলোমেলোভাবে সেগুলো আসা-যাওয়া করলই; যতক্ষণ সে সজাগ ছিল।

নিকষ কালো অন্ধকারের রাত। যেন অমাবস্যাকেও হার মানাবে। শীতল বাতাস গাছের পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। টুপটাপ করে শিশিরও ঝরে পড়ছে। গাছের পাতা আর ঘাসের ডগায়। হিমেল পরশের শীতল ছোয়াটা কাছারি ঘরের ভেতরেও দাপিয়ে বেড়াতে ভুল করছে না। শীতে শরীর গুটিয়ে গেছে দুই কিশোরের। একে অন্যকে জড়াজড়ি করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে তারা।

ঝিঁঝি পোকারা অনেক আগেই থেমে গেছে। কুকুরগুলোও শেষবারের মতো ডেকে উঠেছে মিনিট দশেক আগে। প্যাঁচাটা বুঝি শীতের কামড়ে বাসা থেকেই আর বের হয়নি আজ। নিশাচর এই পাখিটা আজ আর খাবারের খোঁজে বের হবে না।

শুনসান নীরবতা পুরো এলাকাটা জুড়ে।

দুঃস্বপ্ন দেখছে বিপ্লব। ওকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে একদল জংলি মানুষ। চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জংলিগুলো সাদা পোশাক পরা মানুষে পরিণত হয়ে গেল। ইয়া লম্বা শরীর তাদের। পেশিগুলো খুব মজবুত। যে লোকটা ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে, তার গায়ে যেন দুনিয়ার সব শক্তি ভর করছে। শরীরটাও ভীষণ ঠান্ডা। চামড়া ভেদ করে তার পরশ লাগছে ভেতরে। ঢুকে যাচ্ছে আরও ভেতরে। একটু পরেই সেই ঠান্ডা বয়ে যাচ্ছে তার শিরা-উপশিরা ধরে। ছড়িয়ে যাচ্ছে পুরো শরীরে। কাঁপতে শুরু করেছে সে।

লোকটা ওকে ছুড়ে ফেলল। এক দঙ্গল বরফের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করল বিপ্লব। বরফগুলো গলে পানি বয়ে যাচ্ছে। ধুয়ে যাচ্ছে তার শরীর। আর তা-ই দেখে উল্লাসে চিৎকার করছে লোকগুলো। আরে, ওগুলো তো মানুষ না, সাদা-কালো পশমের ভালুক! মেরু ভালুক।

উঠতে চেষ্টা করছে বিপ্লব। কিন্তু পারছে না। এতটাই ঠান্ডা লাগছে যে, দেহের কোনো পেশিই কাজ করছে না। সবগুলোই যেন অবশ হয়ে গেছে। রক্ত চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

দূরে কোথাও 'খুটখুট' করে শব্দ হলো। চোখ মেলতে চেষ্টা করল সে। বার তিনেক চেষ্টার পর পুরো চোখ মেলতে পারল। চোখে এসে ঢাক্কা খেল একরাশ অন্ধকার। মুহূর্তেই সব মনে পড়ে গেল। সে আসলে স্বপ্ন দেখছিল।

ভীষণ শীত পড়েছে। এই শীতেই কাঁপছে সে এখনও।

কিন্তু শব্দ হলো কীসের?

চোখ মেলে ওভাবেই পড়ে রইল সে। কান খাড়া করে ফেলেছে।

আবার হলো শব্দটা। এবার স্পষ্ট।

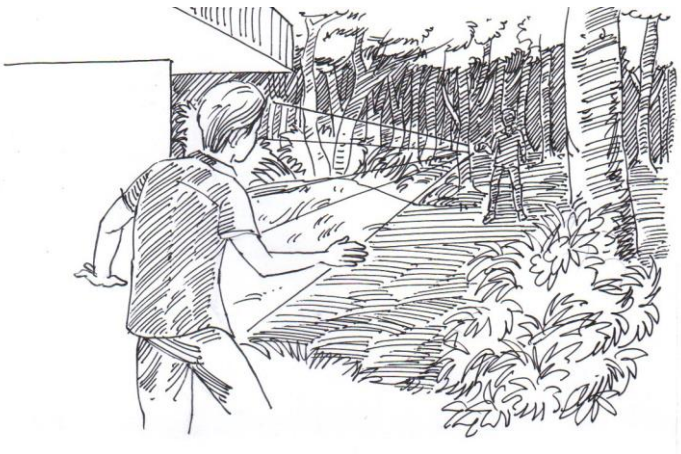

দরোজাটার ঠিক বাইরে এসে থামল শব্দটা। যেন ভারী পায়ে হেঁটে এসে থামল কেউ বা কিছু।

আফজালকে কি ডাকবে? না থাক, আগে দেখা যাক ব্যাপারটা কী।

পুরোনো কাঠের দরোজার ফাঁকফোকর গলে ভেতরে মৃদু আলোর রেখা এসে ঢুকল। টর্চের আলো হবে—ভাবল বিপ্লব। তার মানে কোনো মানুষই হবে।

টর্চের আলো এপাশ-ওপাশ নেচে বেড়াল। তারপর স্থির হলো দরোজার খিল লাগানো যেখানে, ঠিক সেখানটাতে।

সতর্ক হয়ে উঠল বিপ্লবের সমস্ত স্নায়ু।

ধীরে ধীরে শব্দ না করে উঠে বসল, যদিও শব্দ না করে এই খাট থেকে নামা প্রায় অসম্ভব।

নেমে পড়ল খাট থেকে। বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরোজার দিকে, একটু কৌণিকভাবে।

একটু নড়ে উঠল দরোজাটা।

সরে গেল বিপ্লব। ভাবল, কেউ কি খুলতে চাইছে দরোজা? কেন?

আবারও নড়ল দরোজা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে রইল বিপ্লব।

নিভে গেল টর্চের আলো। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল এক জোড়া ভারী পদশব্দ।

এতক্ষণে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা ফোঁস করে ছাড়ল বিপ্লব।

পরক্ষণই তার পঞ্চেন্দ্রিয় কিছুর তাগাদা দিলো। দ্রুত হাতে তবে সাবধানে দরোজার খিল খুলল। বাইরে ও ভেতরে উভয় জায়গায় অন্ধকার থাকায় আলো বা অন্ধকারের কোনো পরিবর্তন হলো না।

নেচে নেচে এগিয়ে যাচ্ছে এক চিলতে আলো। তাকে বারবার ঢেকে দিচ্ছে লম্বা একটা ছায়া। অর্থাৎ লোকটা চলে যাচ্ছে।

বারান্দা থেকে নিচে নেমে এলো বিপ্লব। ভাবল একবার, তাকে অনুসরণ করবে। কে এসেছিল, কেন এসেছিল তা জানার চেষ্টা করবে। কিন্তু পরক্ষণই চিন্তাটা বাতিল করে দিলো। এমনিতেই অনেক রিস্ক নিয়ে ফেলেছে সে। সেটা আর বাড়াতে চায় না।

গলার স্বর অনেকটাই নামিয়ে তবে দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞেস করল—'এই যে, কে আপনি?'

স্থির হয়ে গেল আলোটা। দুটো মুহূর্ত ওভাবেই থাকল। তারপর আলোটা ঘুরে এপাশে চলে এলো। ওপরে উঠে এলো টর্চের আলো। সরাসরি বিপ্লবের চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়ল।

চোখজোড়া ধাঁধিয়ে গেল তার। শব্দ করে ঢোক গিলল।

পাঁচ

চোখ-মুখ থেকে বুক, পা তারপর নিচে নেমে গেল আলোটা। এগিয়ে আসছে আলোর মালিক। তার সামনে ঠিক চার হাত দূরে এসে থামল। চিনতে পারল টর্চের মালিককে, আজমল হাওলাদার।

'ও আপনি!' বলল বিপ্লব। আপাতত এই কথাটাই এলো তার মুখে।

'দুঃখিত তোমাকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য।' বললেন আজমল হাওলাদার। 'আসলে প্রচণ্ড শীত পড়েছে তো, তাই এসেছিলাম এই চাদরটা দিতে। আসলে হয়েছে কী, বাড়িতে অতিরিক্ত কোনো কাঁথা বা কম্বল নেই তো, তাই সে সময় দিতে পারিনি। কিন্তু শীত বেশি পড়াতে আর থাকতে পারলাম না। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছিল তোমার।' কথাগুলো বলার সময় সেগুলো কেমন বেঁধে বেঁধে যাচ্ছিল। কিন্তু অন্ধকার হওয়াতে আজমল হাওলাদারের মুখের পরিবর্তনগুলো দেখতে পারল না বিপ্লব।

'তা ঠিক, শীত বেশ পড়ছে। রীতিমতো তো কাঁপছিলাম আমি।' চাদরটা নিতে নিতে বলল বিপ্লব। কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে বাড়িতে অতিরিক্ত কোনো কাঁথা বা কম্বল নেই এই কথাটা। এটা হতেই পারে না। গ্রামে এমন কোনো বাড়ি নিশ্চয়ই নেই, যে বাড়িতে অতিরিক্ত দু-একটা গরম কাপড় নেই।

আজমল হাওলাদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাদরটা নিয়ে রুমে ফিরে এলো বিপ্লব। দরোজা আটকে দিয়ে চাদরটা দিয়ে দুজনের শরীর বেশ করে ঢেকে নিল। শীত পুরোপুরি না কমলেও কিছুটা আরামবোধ হচ্ছে এখন।

অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়ল বিপ্লব।

* * *